রসূলে খোদা
ও
আমাদের জিন্দেগী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা ত, বাংলাদেশ

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কয়েকজন অমুসলিম চিন্তাবিদের অভিমত

★"এই পৃথিবীতে যদি কোন মানুষ খোদাতা'লাকে পেয়ে থাকেন, যদি কোন মানুষ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে খোদাতা'লার এবাদতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে থাকেন, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আরবের নবী (সাঃ)-ই, সেই ব্যক্তি।"

★"মনুষ্য জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে মোহাম্মদ (সাঃ) তার মধ্যে শুধু মহোত্তমই নন সাধুতমও বটে।"
(এ,জি, লিওনার্দঃ'ইসলাম-হার মরাল এ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু')

★"এটা বলা ভুল যে, তরবারি দিয়েই ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে কখনই তরবারির ব্যবহার হয়নি। তরবারি দিয়েই যদি ধর্ম প্রচার করা যায়, তবে কেউ উদ্যোগী হয়ে আজকের দিনে তা দেখিয়ে দিলেই তো পারেন।" *(অধ্যাপক রামদেবঃ সম্পাদক, বৈদিক ম্যাগাজিন)*

★"ইসলামের নবী (সাঃ) একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধনী ও নির্ধনের মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করেছিলেন এবং মানব জাতিকে সত্যিকারের সাম্যের শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের জীবনের সর্বস্তরেই পথ প্রদর্শনকারী। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজার চেয়েও বড় ছিলেন, এবং জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ।" *(এইচ, জে রোস্তমজী, বার এ্যাট-ল)*

★"ইসলামের নবী (সাঃ) ছিলেন একজন মহান রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভকারী নেতা। আল্ কোরআন যীশু খৃষ্টের ভূয়সী প্রশংসা করেছে, সুতরাং একজন খৃষ্টান হিসাবে আমি ইসলামের নবীকে সম্মান দেখাতে বাধ্য। খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল যখন এই পবিত্র পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁহার পবিত্র মসজিদের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলিম খলীফাগণের আমলে খৃষ্টান গীর্জাগুলি পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল। এই পবিত্র পয়গম্বরের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত এদেশেও অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।" *(দেওয়ান বাহাদুর এস. পি. সিংহঃ পাঞ্জাবের খৃষ্টান নেতা)*

-তয় প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য

রসূলে খোদা ও আমাদের জিন্দেগী

সূচনা ঃ প্রায়ই দেখা যায় যাকে যত বড় করে মহান করে ভাবা হয়, জীবন হতে সমাজ হতে যেন তাকে তত দুরে সরিয়ে রাখা হয়। নবী রসূলগণের বেলায় কথাটা বিশেষভাবে খাঁটে। যখনই কোন নবী নিজের দাবী, শিক্ষা ও আদর্শ পেশ করেছেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে–এ অতি সাধারণ মানুষ অথচ অসাধারণ অবাস্তব কথা বলছে; নিশ্চয় তার মাথা খারাপ হয়েছে ইত্যাদি। তিনি বাস্তবতার সাথে কঠোর সংগ্রাম করে চলেন। তাঁর প্রদত্ত আদর্শ যে অবাস্তব অপ্রয়োজনীয় নয় বরং কল্যাণকর ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজের জীবনকেই জনগণের সম্মুখে তুলে ধরেন।

আদর্শকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে আর দশজনের মত তিনিও মাটির ধরা হতে বিদায় নেন। তাঁর অনুগামীরা তাঁকে তখন বড় করতে শুরু করেন। যিনি ছিলেন 'অতি সাধারণ' তিনি হয়ে উঠেন অতিশয় অসাধারণ। যা তিনি কখনো দাবী করেননি তথাকথিত অনুগামীরাই তাঁর পক্ষে ঐ দাবী করে বসেন। মানব ও মহামানবের সীমানা পার করে তাঁকে স্বয়ং ভগবানের স্থান দিয়ে বসেন। এই 'বড়' কল্পনার বড় বাস্তবতাহীন বড়, ধরাছোঁয়ার বাইরের বড়। এই বড় দিয়ে ব্যক্তি বা জাতির তেমন কোন ফায়দা হতে পারে না। অথচ দেখা যায় নবী রসূলগণ শুধু নিজেরাই বড় ও মহান নন–তাঁরা চান অনুগামীরাও যাতে তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করে বড় ও মহান হয়ে উঠে। নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই যে নবীকে মানে যেন তাঁর আদর্শের প্রতীক হয়; ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করে এজন্য সব নবী রসূলই তাগিদ দিয়ে গিয়েছেন। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই তাগিদ দিতে গিয়েই তাঁদেরকে যত সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা না হলে তাঁরা যদি তাঁদের কথা শুধু মুখে বলে বা লিখে যেতেন তবে হয়ত এত সব ঝামেলার সম্মুখীন হতে হতো না। বস্তুতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টি

জীবনে নিজেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিরামহীন প্রচেষ্টাই তাঁদের সামনে পাহাড়তুল্য বাধা বিপত্তি উপস্থিত করেছে।

জীবন ও আদর্শ ঃ মুল আলোচনায় যাওয়ার পুর্বে আরো দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে। একটু গভীরভাবে বিচার করলেই দেখা যায়, একদিকে মানুষ যেমন সৃষ্টির সেরা, অপরদিকে তার মত অসহায় জীবও বড় একটা নেই। শারীরিক দিক দিয়ে মানবশিশু খুবই অসহায়। মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে অনেকদিনে তার এই অসহায়ত্ব ঘুঁচতে থাকে। তার মানসিক অসহায়ত্ব ঘুঁচে কোন্ উচ্চ আদর্শের পরশ পেয়ে।

তা ছাড়া সামাজিক জীব বলে তাকে নৈতিক জীবন স্বীকার করতেই হয়। স্রষ্টার অস্তিত্ব যারা স্বীকার করেন তাদেরকে আধ্যাত্মিক জীবনও মেনে নিতে হয়। বস্তুতঃ নবী রসূলগণ মানুষের শারীরিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব জীবনকেই স্বীকার করেন। তাঁরা খোদাদত্ত আদর্শের দাবী করেন, তা সমাজের সামনে পেশ করেন। শুধু তাই নয় তাঁরা যে আদর্শের বাহক বলে দাবী করেন সে আদর্শের পরিপূর্ণ 'মডেল' হিসেবে নিজের জীবনকেই জনসমক্ষে অনুসরণের জন্য তুলে ধরেন।

এই তুলে ধরার মাঝে প্রধানতঃ তিনটি দিক থাকে। প্রথমতঃ তিনি যা বলেছেন তা ফাঁকা বুলি নয়, ফাঁকি দেয়ার জন্যও নয়। তিনি কথার তুবড়ীতে বাজিমাৎ করতে দাঁড়াননি। মুখে যা বলেন জীবনে তা প্রতিফলিত করে দেখান। বস্তুতঃ আদর্শনিষ্ঠাই তাঁর শক্তির আকর। দ্বিতীয়তঃ তিনি যা বলেন তা শুধু কল্পনার বিলাস নয়। ঐ আদর্শ জীবনকে কতো সুন্দর, কতো মহান করে তুলতে পারে এর প্রথম ও প্রধান উদাহরণ হন তিনি নিজেই। তাঁর আদর্শকে কিভাবে রূপায়িত করতে হবে তাও দেখিয়ে যান। তৃতীয়তঃ সমাজ জীবনের সব স্তরেই তাঁর আদর্শ গৃহীত হো'ক। সব অনুগামীই তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিক। প্রত্যেকেই নিজের জীবনকে নবীর জীবনের সাথে মিলিয়ে চলুক। আমরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কয়েক হাজার মাইল দূরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এত দূরের লোককে আমাদের জীবনে টানাটানি করে অথবা সময় ও শক্তি ক্ষয় করে লাভ কি? প্রশ্নের উত্তর হলো, আমাদের আধুনিক জীবনে রসূলে-খোদার আদর্শ কি ভাবে উপকারে আসে তা অকাট্যভাবে দেখিয়ে দেয়া। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, দেখিয়ে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়ার মাঝে আসমান যমীন ফারাক রয়েছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। দেখব আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তাঁর আদর্শের প্রয়োজন কতখানি। ব্যবহারিক জীবন সংকীর্ণ অর্থে না নিয়ে ব্যাপক অর্থে নিতে হবে। যে চাষী মাঠে ঘাটে কাজ করছে তার যেমন ব্যবহারিক জীবন আছে, যে ব্যবসায়ী হাটে-বাজারে, শহর-বন্দরে বেচা-কেনা করছে তার যেমন ব্যবহারিক জীবন আছে, তেমনি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বসে সাধনা করছেন, যে রাজনীতিজ্ঞ দেশবিদেশের কথা ভাবছেন তারও ব্যবহারিক জীবন আছে। এক কথায় অজানা অজ্ঞাত পল্লীর কৃষক হতে জাতীয় ও জাতিপুঞ্জের কর্মকর্তাদেরও ব্যবহারিক জীবন আছে আদর্শের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনকে যে যতটুকু অবজ্ঞা করবে তার জীবন ততটুকু পঙ্গু হবে। যে যেখানেই থাকি না কেন আমরা মানুষ তাই মনুষ্যত্ব অর্জনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে সবাইকে এবং ইহাই হবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে বিচার করার প্রথম ও প্রধান মাপকাঠি।

শৈশব ও কৈশোর ঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকতে পিতৃহীন হন। ছয় বৎসর বয়সে মাতাকে হারান। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই কেউ শৈশবে পিতা বা মাতা বা উভয়কে হারালে তার মানুষ হওয়ার আশা অনেকটা ছেড়ে দিতে হয়। ঐরূপ ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বখাটে হয়ে উঠে। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) পিতা-মাতাকে হারায়ে মানুষ হলেন, হলেন তিনি নবী। সেখানেই শেষ নয়, হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এখানে পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে মেয়েদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) আশার বাণী নিয়ে এসেছেন। শিশুকাল হতে যদি আমরা পরমপিতাকে জীবনের চরম সাথী করে নিতে পারি তবে মানুষ হওয়ার কোন বাধাই দুর্লঙ্ঘ হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

মোহাম্মদ (সাঃ) শিশুকাল হতেই আপন মনে বড্ড ভাবতেন। ঝগড়া ফাসাদ করতেন না। বরং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ঝগড়া ফাসাদের মীমাংসা করে দিতেন। এখানে হয়ত প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, সব শিশুতো আর তেমন হয় না। বরং অনেক শিশুই ডানপিটে হয়, ঝগড়াটে স্বভাবের হয়। এখানে শিশুর মা-বাপকে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা ছেলে মেয়েদেরকে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। মিথ্যা বলেনি বলে, চুরি ছেঁচরামি করেনি বলে শুধু গালি নয় চর থাপ্পরও দিয়ে থাকেন। অনেকে আবার মনে করেন যে, তাদের ছেলে মেয়েরা কোনই অন্যায় করতে পারে না। অন্যের ছেলে

মেয়েদের উপর অযথা দোষ চাপিয়ে দিয়ে অন্যায়ভাবে শোরগোল তুলে দেন। এই ভাবেই তারা নিজ হাতে নিজের সন্তানকে বিপথে চলার পথ করে দেন। আমাদের উচিত শিশু মোহাম্মদকে (সাঃ) সামনে রেখে নিজেদের সন্তানদের মধ্যে ঐসব গুণাবলী বিকাশের জন্য সাহায্য করা, উৎসাহিত করা।

কিশোর বয়সে তিনি হিলফুল ফুযূল নামক একটি সংঘের সদস্য হন। তিনি সব সময়েই এই সংঘের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে গেছেন। আজকাল আমরা আমাদের কিশোরদের জন্য নানা ক্লাব করছি। ঐসব ক্লাবের মাধ্যমে যদি আমরা তাদের মধ্যে সমাজ সেবা ও আনুগেত্যের নিষ্ঠা জাগিয়ে তুলতে না পারি তবে ক্লাবে কি লাভ তা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

নবুওয়তের দাবী পেশ করার পরও তিনি এই সংঘের দায়িত্ব ভুলেননি। এই সংঘের সদস্য হিসেবে তাঁর চরম শত্রু আবুজাহলের নিকট গিয়ে তিনি একজন পাওনাদারের পাওনা আদায় করে দেন। এখানে দু'টো বিষয় স্মরণ রাখলে আমাদের সামাজিক জীবনের অনেক অনাচার দূর হয়ে যাবে। প্রথমতঃ কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে ইহার আদর্শের প্রতি সর্বদা আন্তরিক আনুগত্য নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নয়, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে পর্যন্ত কোন সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভেংগে দেয়া না হয় সে পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কোন সদস্যেরই ইহা ভেংগে গেছে বলে ধরে নেয়া উচিত নয়। আজকাল আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন আন্তরিকতা ও আনুগত্যের উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছি। তবে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আকাশ ছেড়ে মহাকাশে উঠলেও আন্তরিকতা ও আনুগত্যের উর্ধ্বে উঠে গেলে কখন কখন ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে, কিন্তু বিনিময়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা হারাতেই হবে। আমাদের চোখের সামনে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে।

যৌবন ঃ যৌবন জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে। সুবোধ শিশু, সম্ভাবনাময় কিশোরও এখানে এসে হোঁচট খায়, তলিয়ে যায়। বিশেষ করে যদি তেমনি সংগী সাথী না মিলে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তাঁর পক্ষে সুসংসর্গ পাওয়া, সুসমাজে গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু সমাজে থেকে, সবার সাথে থেকেও তিনি যেন একক জীবন যাপন করতেন। তিনি যেন অনাচারের মধ্যে আচারের প্রতীক, অসত্যের মধ্যে সত্যের সাধক। তিনি ছিলেন সবার

আদরের 'আল-আমীন'। এখানেও তাঁর জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু বুঝবার আছে, শিখবার আছে। অনেকে বলে থাকেন যে, বর্তমানে সমাজের যা অবস্থা তাতে এককভাবে সৎ জীবন যাপন করা দুরূহ ব্যাপার। বরং অযথা বিপদ ডেকে আনার চেয়ে দেশের সাথে মিলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যাপারটি যে দুরূহ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু যতই দুরূহ হোক না কেন, সমাজ যতই পতিত হোক না কেন- একবার সত্যবাদী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, সমাজ তাকে সম্মানের আসন দিবেই। সত্যের জয় গান গাইবেই। পতিত আরব জাতি কর্তৃক স্বতস্ফূর্তভাবে মোহাম্মদকে (সাঃ) 'আল-আমীন' উপাধি দান নৈরাশ্যকে দুর করে প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। এখানে আরো একটি কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজে সত্যবাদী ও সত্যের দিশারী না হলে সামাজিক জীবনে কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আমরা যদি সত্যপ্রিয় না হই, ছেলেমেয়েদেরকে সত্যবাদী করে গড়ে তোলার প্রয়াস না পাই, তবে সামাজিক জীবন হতে অসত্য, অনাচার, অত্যাচার, অবিচার অশান্তি কখনও দূর হবে না, বরং আমাদেরকে ওসব অক্টোপাশের মত আরো নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। সত্যকে বিদায় দিয়ে সামাজিক জীবনের অরাজকতা দূর করতে যাওয়া স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতই হবে। হচ্ছেও তাই।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর যখন ২৫ বৎসর বয়স তখন ৪০ বৎসর বয়স্কা হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানেও আমাদের কতকগুলো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য ও শিক্ষা করার আছে। ইতিপূর্বে বিবি খাদীজার আরো দু'বার বিয়ে হয়েছিল। বয়সের তারতম্য, ধন-দৌলতের ব্যবধান এ সবকে আধুনিকতার ধূয়া তুলে বিয়েতে অযথা গুরুত্ব দিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে গিয়ে শোকের ঘর গড়ে উঠেছে। দাম্পত্য জীবনের মৌলিক উপাদানসমূহকে অগ্রাহ্য করে আধুনিকতার জৌলুসে মাতলে সাময়িক ভোগ বিলাস চরিতার্থ হতে পারে কিন্তু সুস্থ সরল পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে উঠতে পারে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সাথী,একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোন যুগেই নরনারী সুখের নীড় গড়তে পারেনি আর কখনও পারবে বলেও মনে হয় না। এ যুগেও এসবকে ত্যাগ করে নয় গ্রহণ করেই যৌবনকে, জীবনকে সুন্দর শোভন করতে হবে। অনাবিল ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাই দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর, শোভন ও সুখের করে তোলে। বিবি খাদীজা হযরতের চালচলন ও কাজ

কর্ম দেখে আকৃষ্ট হয়েই নিজে অনুরাগী হয়ে নিজের অধীনস্থ কর্মচারীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনিও বিধবা বিয়ে করে এমন একটি উদাহরণ স্থাপন করলেন যার জন্য অনেক জাতিকে যুগ যুগ ধরে আন্দোলন করতে হয়েছে, আইন পাশ করতে হয়েছে। তিনি ধর্মের নামে, সংস্কারের নামে অযথা অত্যাচারিত বিধবাদের সামনে এক নতুন জগৎ তুলে ধরলেন, তাদেরকে সহমরণের অমানুষিক জ্বালা হতে উদ্ধার করলেন। উদ্ধার করলেন জীবনভর বৈধব্য জ্বালার অযথা ভোগান্তি হতে; জোর করে চাপানো বৈরাগ্যের বোঝা হতে। মোহাম্মদ (সাঃ)–এর আদর্শ তাদের আর্ত ফরিয়াদ ও নীরব অশ্রুকে দুনিয়ায় আকাশ–বাতাস হ'তে বিদায়ের পথ দেখালেন। দেড় সহস্র বছর পূর্বের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বলে এযুগে এই আদর্শকে হেয় জ্ঞান করে সুষ্ঠু সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে পারব কি?

কাল পাথর ঃ মক্কার ঘরের কাল পাথরকে স্বস্থানে পুনর্বাসন নিয়ে রক্তারক্তি শুরু হয় বুঝি! একবার শুরু হলে– কত যুগ ধরে এই স্রোত চলবে কে জানে! এ রক্তপাত হতে নিজেদের বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন গোত্রের সবই মিলে ঠিক করলেন, পরদিন সর্বপ্রথম তারা যাকে দেখতে পাবে তার উপরে ভার দিবে এই সমস্যা সমাধানের। তারা মোহাম্মদকেই (সাঃ) দেখতে পেলেন। তাঁর উপরই এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। তিনি যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান করলেন তা অতুলনীয়। নিজের চাদরের উপর নিজ হাতে পাথরটিকে রাখলেন। সব গোত্রের সর্দারসহ চাদর ধরে পাথরটিকে স্বস্থানে নিয়ে রেখে দিলেন।

এই সুন্দর মীমাংসায় সবাই সন্তুষ্ট হলো, সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্ল। এখানেও আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। তিনি কোন গোত্রকেই প্রাধান্য দেননি। আবার কাকে অবহেলাও করেননি। সবাইকে ন্যায্য অধিকার দিলেন, সম্মানের অধিকারী করলেন। আমরাও যদি আমাদের পারিবারিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সবার ন্যায্য অধিকার ও সম্মান রক্ষা করার নীতি গ্রহণ না করি তবে অশান্তির হাত হতে কখনও রক্ষা পাব না– কথাটা জোর দিয়েই বলা চলে ।

এখানে আরো দু'একটি কথা ভেবে দেখবার আছে। এই ঘটনার ভিতর দিয়ে স্রষ্টা যেন ঐ ঈংগিত দিচ্ছেন যে, মোহাম্মদের (সাঃ) চাদরকে অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কাল পাথরের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা হয়ত মানবতার কাল অংশেরই প্রতীক স্বরূপ ছিল। রংগের প্রশ্ন তুলে আজ যে

কাল আদমীদেরকে মানবতার অধিকার হতে অযথা বঞ্চিত করা হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা দ্বারা মোহাম্মদের (সাঃ) আদর্শ দ্বারাই তাদেরকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। ইসলামের পুণ্য পরশে আফ্রিকা মহাদেশে ঐ শুভ সূচনাই দেখা যাচ্ছে। এই মহাদেশের ভবিষ্যৎ যে ওয়াশিংটন বা মস্কোতে নির্দ্ধারিত না হয়ে পনর শত বৎসরের পূর্বেকার ধ্বংসর আরব মরুর এক উষ্ট্র চালকের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হচ্ছে একথা বহু শ্বেতকায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও বলতে শুরু করেছেন। এখানে আমাদের একটা প্রধান কর্তব্য হলো, যে স্রোত আবার নতুন করে বইতে শুরু করেছে, ইহাকে জোরদার ও সফলকাম করে তোলা। একমাত্র ইসলামই বলতে পারে কারো গায়ের রং তার কোন কলংক নয়, বরং খোদারই দান। ইসলাম মানুষের বিচার তার রং দিয়ে না করে কর্ম, আদর্শ ও নিষ্ঠা দিয়ে করে।

নবী জীবনের প্রাথমিক পর্যায় ঃ হযরত নবী করীম (সাঃ)–এর নিকট সর্বপ্রথম যে পাঁচটি আয়াত নাযেল হয় তার বাংলা তর্জমা হলোঃ

(১) পাঠ কর, স্বীয় প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন;
(২) মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন–'আলাক'হইতে;
(৩) পাঠ কর, তোমার প্রভু সেই মহিমাময়;
(৪) যিনি লেখনী দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন;
(৫) মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না।

আমাদের জিন্দেগীর জন্য আয়াতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি দিকে ইংগিত করছি। প্রথমে 'ইক্‌রা' অর্থাৎ 'পাঠ কর' কথাটিই ধরা যাক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে লেখাপড়া জানতেন না একথা নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা সবচেয়ে ভাল জানতেন। তবে এই 'পাঠ কর' বলার অর্থ কি, রহস্য কোথায় তা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। জিব্রাঈলের বলার সাথে মুখে মুখে উচ্চারণ করে যাওয়ার মধ্যেই যদি ইহার অর্থ শেষ করা হয়, তবে ভুল করা হবে। এই পাঠ করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। পাঠ কর অর্থাৎ বুঝ, অনুধাবন কর, উদঘাটন কর। পাঠ কর– প্রকৃতির গূঢ় রহস্য। একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা হতে মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কত লীলা খেলা চলেছে। পাঠ কর– সৃষ্টির ভিতর দিয়ে স্রষ্টার গুণাবলী ; পাঠ কর– ব্যক্তি ও জাতির উত্থান পতন ..।

যে জাতি এই পাঠের কাজকে যত গভীরভাবে গ্রহণ করেছে– সেই জাতিই প্রকৃতির রহস্যকে তত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে ও

স্রষ্টার গুণাবলীকে তারা তত নিবিড়ভাবে জীবনে প্রতিফলিত করার সুযোগ পাচ্ছে। তারাই জ্ঞানের রাজ্যে ধ্যানের জগতে অফুরন্ত দান করে চলেছে। নিজেরা উন্নতি করছে–অন্যদের উন্নত হওয়ার পথ বাতলাচ্ছে।

কলমই যে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সবচেয়ে বড় উপাদান হয়ে দাঁড়াবে– এখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুতঃ কলমের জোরেই আদম সন্তান তার যাত্রাপথকে এত গতিশীল করতে পেরেছে। যে জাতি কলম ধরতে শিখেনি, যে জাতি কলম ধরতে ভুলে যাচ্ছে, অবজ্ঞা করছে সে জাতিই পেছনে পড়ে আছে। এই সহজ সত্যটি বিশ্বনবীর উম্মত বলে দাবী করে, বড়াই করে আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নিকট নাযেল হওয়া প্রথম বাণীকে আমরা বাস্তব জীবন হতে কত দূরে সরিয়ে রেখেছি, চিন্তার দুয়ারে আমরা খিল এটেছি; জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাধনায় পিছটান দিয়েছি; যেন এ সবের বালাই আমাদের নেই অথচ ভালাই আমাদের হউক। স্বতঃই মনে জাগে –ইয়ে কেয়সা উম্মত হ্যায়! বিশ্ব নবীর নিকট প্রথম যে বাণী নাযেল হয়েছিল ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে ইহাকে রূপ দেয়া আমোদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমাদের জিন্দেগী সেই সাক্ষ্য, সেই লক্ষ্য বহন করে কি? আমাদিগকে আবার নতুন করে 'পাঠ করার' পাঠ নিতে হবে এবং যত শীঘ্র আমরা সত্য ও জ্ঞানের সাধনায় প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মত মনোনিবেশ করবো তত শীঘ্রই আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবো। তা ছাড়া আর কোন সহজ পথ নেই, তা না হলে আমাদের উদ্ধার পর্ব শুরুই হবে না।

তায়েফের শিক্ষা ঃ নবীগণ তাঁদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। তাদের ভক্ত অনুরাগীরা এজন্যে তৎপর হন, ত্যাগ স্বীকার করেন। রসূল করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যে আদর্শ রেখে গেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। এখানে আমরা শুধু তায়েফের ঘটনাটি উল্লেখ করতে যাচ্ছি। মক্কাবাসীরা হযরতের (সাঃ) প্রচারে প্রবল বাঁধা সৃষ্টি করে চলেছে। তাদের শত্রুতার শেষ নেই। খোদার রসূল (সাঃ) ভাবলেন, তায়েফে গিয়ে দেখা যাক সেখানে খোদা–প্রেমিক আছে কিনা। কিন্তু কোথায় পাবে খোদা–প্রেমিক–শয়তান সেখানে আরো বড় করে জাল পেতে বসে আছে। নবীজির কথা শুনে তারা তাঁর উপরে পাথর বর্ষণ শুরু করলো। তিনি জখম হলেন, তার পবিত্র দেহ হতে তপ্ত লহুর স্রোত বইল, সত্যকে প্রতিহত করার জন্য নিষ্ঠুর মানুষ নিল কঠিন পাথরের

আশ্রয়। কিন্তু তাদের জন্য মহানবীর (সঃ) হৃদয়ে তখনও প্রেমের ফোয়ারা বইছে। খোদার দরগাহে তিনি দরদে দিলে মোনাজাত করছেন যেন এই অবুঝ অজ্ঞানদের উপর কোন গযব নাযেল না হয়। তারা না হলেও তাদের বংশধরেরা সত্যের সন্ধান পেতে পারে।

খোদার রসূলের এই উদাহরণকে সামনে রেখে ব্যবহারিক জীবনে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে তা না হলে আমাদের বর্তমান দুরবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ সত্যের প্রচারের জন্য দরকার আমাদিগকে ঘর ছেড়ে,বাড়ী ছেড়ে, প্রিয়জন ছেড়ে বাইরে যাওয়ার । আর শত্রুদের চরম নির্যাতনেও তাদের মঙ্গল কামনা করে মংগলময়ের দরগাহে গিরিয়াজারি করতে হবে। বস্তুতঃ এমন অবস্থাতেই মানবতার প্রতি কার কতখানি দরদ তার পরীক্ষা হয়ে থাকে আর পরীক্ষা হয়ে তাকে সেই দরদ মৌখিক না আন্তরিক । বর্তমানে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন হতে ইসলামের তবলীগকে একরূপ বিদায় দিয়েছি । এমন কি যারা একাজ করতে চেষ্টা করেন–তাদেরকে আড় চোখে দেখার অভ্যেস গড়ে তুলছি। এই নিঃচেষ্টা ও মানসিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মুসলিম জাহান আজ এত নিম্নস্তরে পৌছেছে।

তবলীগ শুধু আদর্শ প্রচারেই সাহায্য করে না মানুষের আত্মসংশোধনেরও ইহা একটি প্রধান পথ। তবলীগ ছিল ইসলামের জীবন শিরা। এই শিরাকে অবজ্ঞা অবহেলায় ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে । জীবন শিরা হারিয়ে আমরা নিশ্চল নির্জিব অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। এই অবস্থার পরিবর্তন শুধু তসবীহ তেলাওয়াতে , ওয়াজ নসিহতে হবে না। এজন্য চাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে দেশ বিদেশে ইসলামের তবলীগ করা।

যায়েদের মুক্তি ঃ যায়েদ (রাঃ) অতি আনন্দের সাথে পিতার সাথে আপন ঘরে ফিরে যাবেন কিন্তু বাস্তবে হলো তার উল্টো। তিনি পিতাকে বিদায় করে দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ঘরেই রয়ে গেলেন। কেমন ব্যবহার পেলে মা বাপের স্নেহের বন্ধন, বাড়ী ঘরের মায়া মমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে মানুষ অন্যের ঘরে থাকতে পারে তা আমরা হৃদয়ংগম করার প্রয়াস পেয়েছি কি? আজকাল কাজের লোক নিয়ে আমাদেরকে কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ আমাদের সামনে নবী করীম (সাঃ) ও যায়েদের (রাঃ) উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে কি করে পরের ছেলেকে আপন করে নিতে হয়। কি করে পরের ঘরকে নিজের ঘর করে নিতে হয়। আমাদের ব্যবহারকে জীবনের ব্যবহারের মাধ্যমেই সুন্দর সুমিষ্ট করে তুলতে হবে ।

হিজরত ঃ আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে জন্মস্থান ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হলো । হিজরত যেন নবী বা তাঁর জামাতের জীবনের একটি অপরিহার্য অংগ । যাক সে কথা। খোদার আদেশে নিশীথ রাতের জমাট আঁধারে নবীজি আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে মদীনার পথে পা বাড়ালেন । উপর হতে যে আদেশ হয়েছে তা পালন করার চেয়ে বড় কর্তব্য আর নেই। এখানে আমাদের অনেক কিছু ভাববার আছে, শিখবার আছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় কোন অফিসারকে বদলী করলে অমনি শুরু হয় তদবীর, কি করে বদলীর আদেশকে বদলানো যায়। এজন্য কতো মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়– তা বলে শেষ করা যায় না । শুনেছি এমন অবস্থায় অনেক অবিবাহিত বা বিপত্নীকও নাকি স্ত্রীর আশু প্রসবের সমস্যার অজুহাত পেশ করেছে ওপরওয়ালার সমীপে । অথচ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বদলীর যে আদেশ পেলেন– তাতে 'জয়েনিং টাইম'ও পেলেন না। দেশের ও দশের মংগলের জন্য উপর হতে যখনই যেখানে যাবার আদেশ আসে তা বিনা দ্বিধায় পালন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । অপর দিকে উপর ওয়ালাদেরও উচিত নিজের কোন জিদ বা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেন কাকেও বদলী করা না হয়। অধীনস্থদের বদলীর ব্যাপারে দেশের ও দশের নিশ্চিত মংগলের উদ্দেশ্য থাকা চাই । বস্তুতঃ মক্কা হতে মদীনাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর হিজরতের মধ্যে ইসলামের নিশ্চিত মংগল ছিল। পরবর্তী ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

মদীনার জীবন ঃ মদীনায় এসে হযরত (সাঃ) সেখানকার সব গোত্রের লোকদের সাথে সন্ধি করলেন। উদ্দেশ্য বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক যাতে একত্রে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যেখানেই বসবাস করি না কেন পাড়া পরশীকে নিয়ে মিলে মিশে সুখে শান্তিতে বসবাস করা আমাদের একটি প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে এখানে একটি বিষয় ভেবে দেখা দরকার। যারা সন্ধি করে তা অযথা ভংগ করে তাদেরকে উচিত শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে । তা না হলে সন্ধি করা বা ভংগ করার কোনই গুরুত্ব থাকে না। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার উপর দুনিয়ার সুখ শান্তি অনেক খানি নির্ভর করে ।

এখন চুপ থাকা নয় ঃ জংগে ওহুদের একটি ঘটনা। যুদ্ধে খোদ রসূল (সাঃ) শত্রুর আঘাতে দাঁত হারিয়েছেন। রক্তাক্ত দেহে তিনি পড়ে আছেন। সাহাবারা (রাঃ) দুঃখ কষ্ট গ্লানিতে মর্মাহত । কয়েকজন তাঁদের প্রিয় রসূলের নিকট অপেক্ষা করছেন। শত্রুরা তখন রসূলুল্লাহ্‌ও

সাহাবাদের নাম নিয়ে নিয়ে অহংকারে হাঁক ছাড়ছেন। সাহাবারা প্রতি উত্তর দেয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। নবীজি তাঁদের জওয়াব দিতে বারবার বারণ করছেন। শত্রু হঠাৎ বলে উঠল, মোহাম্মদের খোদা মারা গেছেন, এই আওয়াজ কানে পৌছা মাত্র ক্লান্ত ক্লিষ্ট নবী সাহাবাদের নিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে গর্জে উঠলেন –ওহুদের বন প্রান্তরকে কাঁপিয়ে তুললেন– মোহাম্মদের (সাঃ) খোদা চিরঞ্জীব, কখন মরেনা, মরতে পারেনা।

অথচ বর্তমান যুগে দুনিয়ার কত দেশ হতে আওয়াজ উঠছে খোদা নেই –থাকলেও সে খোদা মারা গেছে। ড্রামা করে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তারা খোদাকে হাত কড়া লাগাচ্ছে, বন্দী করে তাঁকে বেত্রাঘাত করে শাস্তি দিচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত জনগণ হাত তালি দিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছে। আর আমরা মোহাম্মদের উম্মতেরা নীরব সাক্ষী হয়ে আছি। জোরগলায় আওয়াজ তুলছি না– খোদা মরে না, মরতে পারেন না। নবীজির জংগে ওহুদের ঐ গগন বিদারী দীন আমাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে –কিন্তু কোথাও কোন প্রতিধ্বনি নেই ।

খন্দকের যুদ্ধের অমুল্য শিক্ষা ঃ খন্দকের যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় স্মরণীয় । এই যুদ্ধে হুযুর (সাঃ) হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শ মত মদীনার পাশে পরিখা খনন করেন যাতে শত্রুরা এসে বাধা প্রাপ্ত হন। খোদার শ্রেষ্ঠতম নবীও সঙ্গী সাথীদের পরামর্শমত কাজ করতেন। অথচ আমরা বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীরা অধীনস্থদের নিকট হইতে পরামর্শ নিতে কত দ্বিধা সংকোচ বোধ করি এমনকি তাদেরকে আমরা সঙ্গী সাথী বলে ভাবতেই শিখিনি। একত্রে অফিস করে, এক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে পরস্পরকে যদি সঙ্গী সাথী বলে ভাবতে না পারি, তাতে মনের দীনতা ও মস্তিষ্কের শূন্যতাই নগ্ন হয়ে ওঠে না কি? অনেক সময়ে তাদের ভাল পরামর্শকেও হেলা করি, খাটো করে দেখি। সামাজিক জীবনেও উপরতলায় তারাই সব বুদ্ধি সুদ্ধির এক চেটিয়া অধিকারী হয়ে বসেন। খন্দক খননের ধারণাটি আরবদের নিকট নতুন ছিল। কিন্তু বিচার বিবেচনা করে খোদার রসূল ইহাকে গ্রহণ করলেন । অথচ আমরা নতুন কিছু শুনলেই আৎকে উঠি। নতুন হলেই গ্রহণ করতে হবে তা বলছিনে, হেলা করতে হবে তাও ঠিক নয় । বিচার বিবেচনা করে যদি মংগলজনক বলে প্রতীয়মান হয় তবে তা গ্রহণ করতে আমাদের কোন দ্বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়। মঙ্গলকে দুরে সরিয়ে দেয়া ইসলামের শিক্ষা নয়। 'রহমাতুল্লীল আলামীন' মঙ্গলকে দুরে সরিয়ে

দিতে আসেননি। আমাদের উন্নয়নের কার্যসূচী কার্যকরী করতে এই মানসিকতার প্রয়োজন অত্যধিক।

এই সময় ছিল রমযান মাস। খন্দক খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল যারা রোযাদার ছিলেন তাদের চেয়ে যারা রোযা রাখেন নি তাঁর মেহনত করেছিলেন অনেক বেশী । এই উপলক্ষ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন– যারা ঐদিন রোযা রাখেননি, রোযাদারদের চেয়ে তাদেরই ছওয়াব হবে বেশী। তা'ছাড়া সেদিন সব ওয়াক্তের নামায একত্রে জমা' করে পড়া হয়েছিল । এই সব বিষয় হতে এই ইংগিতই পাওয়া যায় যে, ইসলামকে রক্ষা করার চেয়ে মোমেনের নিকট আর কিছুই বড় নয়। ইসলাম না বাঁচলে নামায রোযা কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না। অথচ সেই ইসলামকে ধরা হতে মুছে ফেলতে আজকাল কত পত্র–পত্রিকা বের হচ্ছে–আর ঐ সব পড়েই আমরা নিজেদের জ্ঞানী করে তুলছি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। আমাদের কি উচিৎ নয় ইসলামের আদর্শের যুগের উপযোগী ব্যাখ্যা করে পত্র–পত্রিকা বের করা? আমাদের অনেকের অবস্থাতো এরূপ হয়ে পড়েছে যে, নামায রোযাকে বোঝা মনে করেন; অনেকে সেকেলে আরবদের জন্য এসব ব্যবস্থাদি ছিল বলে মনে করেন; আর একদল তসবীহ তেলাওয়াতের মধ্যে নিজের ইসলাম–প্রীতি ও সেবাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। 'কলমী জেহাদের' কথা খুব কম মুসলমানই চিন্তা করে থাকেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সময়ে খন্দকের প্রয়োজন ছিল ইসলামকে রক্ষ করার জন্য । এ যুগে প্রয়োজন হলো কলমের।

হুদায়বিয়ার মিতালি ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ভিতর দিয়ে যে বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো শত্রু পক্ষ যদি মিতালি করতে এগিয়ে আসে তবে তা প্রত্যাখান না করাই শ্রেয়ঃ, যদি তাতে শান্তির পথ প্রশস্ত হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে । এর পেছনে যুক্তি রয়েছে। শান্তির মধ্যে মানুষ যেভাবে কোন আদর্শকে বিচার বিবেচনা করে, অশান্তির সময়ে তা কখনও সম্ভবপর হয় না। তখন যুক্তির চেয়ে শক্তির দিকেই লক্ষ্য থাকে বেশী আর ভাবপ্রবণতা পায় প্রাধান্য । যুদ্ধাহত দুনিয়ার সামনে হুদায়বিয়ার সন্ধি নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারে। এই আলোর প্রতিফলন দেখাতে হবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর উম্মতগণকেই । কিন্তু মুসলিম জগৎ নিজেদের মধ্যে যেভাবে রেষারেষি ও মন কষাকষিতে ব্যস্ত তাদের দ্বারা বর্তমান অবস্থায় রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) আদর্শের প্রতিফলন সম্ভবপর কি– এ প্রশ্ন জাগা অতি স্বাভাবিক। অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করতে না পারলে অন্যদের সামনে কি তুলে ধরা যাবে?

'নুরের নবী প্রেমের ছবি' ঃ মদীনায় হিজরত ঃ মক্কাবাসীদের অবর্ণনীয় অত্যাচার অবিচারে জর্জরিত হয়ে খোদার রসূল (সাঃ) হিজরত করলেন। সেখানেও তারা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিল না। আল্লাহর্ অশেষ অনুগ্রহে অবশেষে তিনি বিজেতা হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন । এমতাবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবিক ছিল সে জন্য তাঁর শত্রুরা মুহূর্ত গুণছিল। কিন্তু মক্কার ধূলি রক্তরাঙ্গা হলো না; মোহাম্মদের (সাঃ) মাতৃভূমির আকাশে বাতাসে কান্নার রোল উঠল না। আজকে সবাই খুশী, সবারই মুখে হাসি। মোহাম্মদ (সাঃ) যে 'নুরের নবী, প্রেমের ছবি'। তাঁর পুণ্য পরশে মক্কার প্রতি ধুলিকণা ধন্য হলো, ধন্য হলো আরবের অধঃপতিত মানব আত্মা। ঘরে ঘরে আজ আনন্দের ফোয়ারা, মনে মুখে আজ শান্তির বাণী। মোহাম্মদ (সাঃ) আজ তাদের সব অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন । মক্কাবাসীরাও এই ক্ষমার পূর্ণ কদর করেছিল। তারা তাদের পিতৃপুরুষের মতাদর্শ ও নিজেদের জিদের মাঝে আর বন্দী হয়ে রইল না । সত্যকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করে জীবনকে তারা সার্থক করে তুল্ল।

মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা। বর্তমান যুগের যুদ্ধ বিজয়ীদের এখানে কি শিখিবার কিছুই নেই? যদি তাই হয় তবে দুনিয়াতে অশান্তির বহ্নি কখনও থামবেনা, বরং আরো বড় হয়ে জ্বলে উঠবে ।

খোদার বাণী ছড়িয়ে দাও ঃ যুদ্ধ–বিগ্রহ যখন শেষ হয়ে আসল তখন খোদার রসূল (সাঃ) বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ্দের নিকট ইসলামের বাণী দিয়ে পত্রাদি লিখলেন। ইসলামের আদর্শ প্রচারকে তিনি রাষ্ট্রিয় কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে ছিলেন। বর্তমান যুগের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের এই মহান কর্তব্য ভুলে যাওয়া উচিত কি ? তা ছাড়া আমরা বিভিন্ন দেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। বৈষয়িক দিক দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করার আমাদের তেমন কোন সামর্থ্য নেই কিন্তু তাদেরকে আমরা প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়ে কিছুটা ঋণ মুক্ত হতে পারতাম। এদিকটা আমরা ভেবে দেখেছি বলে মনে হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বাণীকে সব রাজা বাদশাহ্ একইভাবে গ্রহণ করেননি । অনেকে অতি সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছিলেন আমরা জানি না আল্লাহ্ কিভাবে মানুষের মনকে সত্য গ্রহণের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। এ পথে এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে যে, অনেক স্থানেই এজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে।

বিদায়ী হজ্জ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বুঝতে পারলেন শীঘ্রই তাঁকে মৌলার দরবারে যেতে হবে। এজন্য তিনি নিজেকে ও জামাতকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। মৃত্যুর ভয়ে কর্ম না ছেড়ে – কর্তব্য পালন করে চল্লেন। জীবনের শেষ হজ্জে তিনি তাঁর উম্মতদের মারফত বিশ্বকে বিদায় বাণী দিয়ে গেলেন। এখানে একটা কথা মনে পড়ে। বিশ্ব নবীকে কত জনে কত ভাবে শেষ নবী বলে প্রচার করছেন। কিন্তু তার শেষ বাণীকে ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবনে কতখানি স্থান দেয়া হচ্ছে সে বিচার করে দেখছি না। তাঁর শেষ বাণীর মর্মকথাঃ মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; ইসলামের বাণী ও আদর্শকে দুনিয়ার কিনারায় কিনারায় পৌছাতে হবে–এসব কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। এসব কথাকে দেড় হাজার বৎসর দূরে রেখে দিলে আমাদের উদ্ধার পর্ব শুরু হবে না, শুরু হবে না সুদিনের আগমনী ।

ওপারের ডাক ঃ অবশেষে সেই দিনটি ঘনিয়ে এলো যেদিন দুনিয়ার মায়ামোহ সব ছেড়ে মানুষকে পরপারে যাত্রা করতে হয়। খোদার রসূল যিনি মানুষের মংগলের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন, সাহাবাদের ডেকে তিনি বল্লেন– আমি যদি তোমাদের কাকেও কোন প্রকার আঘাত দিয়ে থাকি (সে আঘাত অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক) তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে পার । কারণ আমি আমার মৌলার নিকট কোন প্রকার অপরাধ নিয়ে হাজির হতে চাই না। সবাই বুঝতে পারলেন, তাদের প্রাণ–প্রিয় নবীর শেষ ডাক এসেছে। তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিশোধের কথা ভাবতে পারে? যিনি জীবনে কম করে খেয়েছেন –যেন অপরে পেট ভরে খেতে পারে; বেশভূশা কম পরেছেন যাতে অন্যেরা যথেষ্ট পরতে পারে; যিনি দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন যাতে অন্যেরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারে– তার উপর প্রতিশোধ কল্পনার বাইরে। কেমনে তাঁকে বুঝাবেন তাঁর এই আহ্বান তাদের অন্তরকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। তাদের সামনে যে সবচেয়ে বড় দুর্দিনের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। সবাই নীরব, সবাই বিহ্বল ।

একজন সাহাবী তখন দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমাকে অমুক যুদ্ধের সময় আঘাত করেছিলেন –অবশ্য ইহা অনিচ্ছাকৃতই ছিল কিন্তু আমি ইহার প্রতিশোধ নিব। সবাই অবাক–ভাবছে লোকটির কি মাথা খারাপ হয়েছে ? কিন্তু সাহাবী তাঁর ইচ্ছায় অটল । তিনি আরো বল্লেন, তাকে যখন আঘাত করা হয়েছিল তখন তার গায়ে কোন আচ্ছাদন ছিল না । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর কথাতে অটল। তিনি গা খুলে ধরলেন। সবাই ব্যস্ত, সবাই ক্রুদ্ধ । অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন পাগলের পাগলামির পরিণতি দেখতে। দেখছে তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনের পিঠে তারই এক (বেয়াকুফ?) সাহাবীর

ইচ্ছাকৃত আঘাত হানা। কিন্তু একি, ইহার নামই কি প্রতিশোধ! কি অপূর্ব দৃশ্য দেখছেন তারা! সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র পিঠে অশ্রুপূর্ণ চোখে চুমো খাচ্ছেন।

মানুষের অধিকারের প্রতি রসূল করীম (সাঃ) কতখানি সজাগ ছিলেন! এমন নবীর এমনি উম্মত হওয়াই তো স্বাভাবিক। মানুষের অধিকার নিয়ে নেতারা মাথা ঘামাচ্ছেন, তাদের সামনে মোহাম্মদ (সাঃ)- এর উদাহরণ তুলে ধরা আমাদের উচিত নয় কি?

উপসংহার ঃ— রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনে আরবের বালুকা রাশি স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়নি; আরবের বুক চিরে আলাদীনের পরশের ন্যায় বড় বড় দালান কোঠাও বের হয়নি। তবে কি পরিবর্তন এনে তিনি ইতিহাসকে বদলে দিলেন-এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় । এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো-তিনি পরিবর্তন এনেছিলেন আরবদের দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন এনেছিলেন মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে, পরিবর্তন এনেছিলেন মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময়ের আরবদের ও তাঁর তিরোধানের সময়ের আরবদের অবস্থার কথা বিচার করলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য পরিষ্কার হয়ে উঠে। তাঁর আগমনে আরবদের হাত পা'র সংখ্যা বাড়েনি; বাড়েনি তাদের নাক কান, চোখ বা মাথার সংখ্যা, তারা সেই মানুষই ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) জীবন ও আদর্শের পরশে তারা তাদের সুপ্ত শক্তির সন্ধান পান, সন্ধান পান তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের । ঐ শক্তির বলে তারা বিশ্বের ইতিহাসের গতি বদলিয়ে দেন। আমরাও যদি সাহাবাদের ন্যায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারি, যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন এনে নিজেদের জীবন ধারায় পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর হই, তবে আমরাও আমাদের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারব। আমাদের নিকট জীবন নতুন সুরে নতুন কথা নিয়ে ধরা দিবে। আবার আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারব। তখনই রসূলে - খোদা (সাঃ) আমাদের জিন্দেগী হতে আর দূরে থাকবেন না আমরাও তাঁকে কখনও আর দূরে ভাববো না।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪,বকশীবাজার রোড, ঢাকা- ১২১১

* "মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সত্যতার এবং বিশ্বস্ততার একজন আদর্শপুরুষ। বিশ্বস্ত তাঁর কর্মে,তাঁর কথায় এবং কাজে ।"
(টমাস কালাইল)

* "এই মহাগুরু (সাঃ)-এর চরিত্র মানবতার মহামূল্য সম্পদ ।"
(ডঃ হরদয়াল, এম.এ. পি এইচ ডি)

* "মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু সেই দাবীই করে গেছেন, যা তিনি প্রথম করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন সবচেয়ে গভীর দর্শন এবং সবচেয়ে সত্য খৃষ্টান ধর্মও এই দাবীকে তাঁর নবী হওয়ার -খোদাতা'লার একজন সত্য নবী হওয়ার দাবীকে মেনে নিতে সম্মত হবে!" *(বসওয়ার্থ স্মীথ)।*

* "আমি তাঁকে, এই আশ্চর্য মানুষটিকে (মোহাম্মদ সাঃ -কে) গভীরভাবে জেনেছি; এবং আমার মতে তাঁর খৃষ্টবিরোধী হওয়াতো দূরের কথা, তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি,তাঁর মত কোন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করেন, তবে তিনি এর সমস্যাবলী ঠিক সেইভাবেই সমাধান করতে পারবেন, যার ফলে পৃথিবীর বুকে চির আকাংখিত শান্তি ও সুখের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।
ইউরোপ মোহাম্মদ (সাঃ) -এর ধর্মমতের প্রতি রীতিমত অনুরক্ত হয়ে ওঠেছে এবং একথা বলা যায় যে, ইউরোপের ইস্‌লামীকরণ শুরু হয়ে গেছে ।" *(জর্জ বার্ণাড শ')*

* "আগ্রহশীলতা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু । আগ্রহশীলতার মহোত্তম অর্থেই তিনি (মোহাম্মদ -সাঃ) ছিলেন একজন আগ্রহী পুরুষ । এবং এই আগ্রহশীলতাই সেই বস্তু যা জীবিতকালে মানুষকে দূষিত হওয়া থেকে, পচন থেকে, রক্ষা করে ।"
(ষ্টানলি লেন পুল)

* "রাষ্ট্রের অধিপতি,সেই সঙ্গে চার্চের অধিপতি হওয়ায় তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সীজার এবং পোপ; কিন্তু পোপের ভড়ং ব্যতিরেকেই তিনি ছিলেন পোপ এবং সীজারের সৈন্যবাহিনী ব্যতিরেকেই সীজার। কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী ছাড়াই, কোন স্থায়ী দেহরক্ষী ছাড়াই, কোন রাজ প্রাসাদ ছাড়াই, কোন নির্ধারিত খাজনা ছাড়াই, যদি কোনো মানুষ কখনও এই কথা বলবার অধিকার রাখেন যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে রাজ্য শাসন করেছেন, তবে তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)।" *(- বসওয়ার্থ স্মীথ) ।*

প্রকাশনায়ঃ
প্রকাশনা বিভাগ,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১।

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯২
৫,০০০ কপি

Rasule Khoda O Amader Zindegi
by Mohammad Mostafa Ali.
National Ameer.
Ahmadiyya Muslim Jama't, Bangladesh.
Printed at Intercon Associates